মুসলিমের ইউরোপ

ইউরোপীয় প্রেক্ষাপটে ইসলামী সূত্রসমূহের ওপর একটি গবেষণা কর্ম

মূল
তারিক রমাদান

অনুবাদ
এম রুহুল আমিন

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

মুসলিমের ইউরোপ

মূল
তারিক রমাদান

অনুবাদ
এম রুহুল আমিন

ISBN
984-70103-0003-1

প্রকাশকাল
কার্তিক ১৪১৫
শাওয়াল ১৪২৯
অক্টোবর ২০০৮

প্রকাশক
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট
বাড়ী ২, সড়ক ৪, সেক্টর ৯, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০
ফোন : ৮৯৫০২২৭, ৯১১৪৭১৬, ০৬৬৬২৬৮৪৭৫৫, ০১৫৫৪৩৫৭০৬৬
ফ্যাক্স : ৮৯৫০২২৭, Email: biit_org@yahoo.com

মূল্য
১৫০.০০ টাকা, $ 20.00

মুদ্রণ
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা

Muslimer Europe (To be a European Muslim: A Study of Islamic Sources in the European Context) written by Tariq Ramadan and translated into Bengali by M Ruhul Amin and published by Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT), House # 4, Road # 2, Sector # 9, Uttara Model Town, Dhaka-1230, Bangladesh. Phone: 8950227, 9114716, 06662684755, 01554357066, Fax:02-8950227.
Email: biit_org@yahoo.com . Price : Tk. 150, $US 20.00

সূচি

বিষয়		পৃষ্ঠা
পূর্বকথা		০৮
ভূমিকা		১১

প্রথম খন্ড

উৎসের গভীরে বিশ্বাস ও ধর্মীয় অনুশীলন		১৬
ভূমিকা		১৬
অধ্যায় এক :	ইসলামের শিক্ষা ও বিজ্ঞান	১৮
	ক. আবশ্যকীয় শিক্ষা	১৮
	খ. ইসলামী বিজ্ঞান শাস্ত্রের উৎপত্তি	৩০
	গ. মন্তব্য (ধরন ও শ্রেণীবিভাগ)	৪৪
অধ্যায় দুই :	উসূল আল-ফিকহর কিছু সাধারণ নিষ্পত্তি	৫৭
	ক. কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে?	৫৯
	খ. মেনে নেয়ার ভিত্তি	৬৪
	গ. দায়বদ্ধতার রূলিং	৬৭
	ঘ. আল মাসলাহা (জনস্বার্থ বিবেচনা)	৭৫
	ঙ. ইজতিহাদ ও ফতোয়া	৮১
	চ. অগ্রাধিকার ও পদক্ষেপসমূহ	৯৫

দ্বিতীয় খন্ড

স্পর্শকাতর প্রশ্ন-দায়িত্ববোধ, স্বকীয়তা, নাগরিকত্ব ১০৭

ভূমিকা ১০৮

অধ্যায় এক : আমাদের অবস্থান কোথায় ১১৩

ক. বাস্তব পরিসংখ্যান ১১৩

খ. পুরনো ধ্যান-ধারণা ১১৬

গ. মৌলিক নীতিমালা (ও শর্তাবলী) ১২৩

ঘ. ইউরোপীয় সমাজ ১২৬

ঙ. ছোট্টগ্রাম, মুক্ত বিশ্ব ১৩১

অধ্যায় দুই : আমরা কে? ১৪২

ক. আমাদের পরিচয় কী? আমরা কোন্ দেশী ১৪২

খ. ইসলামী উম্মাহ হিসেবে পরিচয় ১৪২

গ. ইউরোপীয় নাগরিক হতে হবে ১৫০

ঘ. গ্রহণ ও বর্জনের মধ্যকার সম্পর্ক ১৬৩

ঙ. ইউরোপীয় ইসলামী সংস্কৃতির অভিমুখে ১৮০

অধ্যায় তিন : সম্ভাব্য সহাবস্থান ১৯২

ক. পর্যবেক্ষণ ও ফাটলসমূহ ১৯২

খ. চার অগ্রাধিকার ১৯৭

গ. সাধারণ চ্যালেঞ্জসমূহ ২০২

উপসংহার ২১১

পরিশিষ্ট-১ : ইউরোপ ও বিশ্বে 'ইসলামী প্রবণতার' দিকসমূহ ২১৪

পরিশিষ্ট-২ : অভিবাসন, সংহতি ও সহযোগিতা নীতিমালা ২২৪

শব্দকোষ ২৩০

অধ্যায় এক

ইসলামের শিক্ষা ও বিজ্ঞান

ক. আবশ্যকীয় শিক্ষা

আপাতবিরোধপূর্ণভাবে, ইসলামের বিজ্ঞানশাস্ত্রের সংগঠন ও ধরনের ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার বিষয়টি প্রতিভাত হয় তখন যখন এ শিক্ষা বিদ্যমান ছিলনা। এ ঘটনাটি ঘটে রাসূল (সা.) এর সময়ে কুরানিক ওহীর যুগে। রাসূল মুহাম্মদ (সা.) তাঁর জনগণের মধ্যে বসবাসের সময়েই ওহী পেয়েছিলেন। এ জনগণের কেউ কেউ তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সাথী হয়েছিলেন। রাসূল (সা.) যে ২৩ বছর ধরে ওহী লাভ করেছিলেন তা বিবেচনা করলে যেকেউ সহজেই সেই মর্মস্পর্শী আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় শিক্ষার পর্যায়গুলো উপলব্ধি করতে পারে। রাসূল (সা.) বা তাঁর সাহাবীদের কেউ ইসলামী বিজ্ঞান বা কোন বিশেষীকরণের সুযোগ পাননি। তারা আল্লাহর কাছ থেকে শিক্ষা পেয়েছেন। সেই বাণী দ্বারা বিধৌত হয়েছেন যা তাদের ধারণাকে গভীরতর এবং বিশ্ব সম্পর্কে জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছে আর এভাবেই তাদের ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের বন্ধনের প্রকৃতিকে এক আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করেছে।

আল্লাহর তরফ থেকে প্রাপ্ত চেতনাবোধ থেকে স্পষ্ট ও ব্যাপক উপলব্ধির ভিত্তিতে তারা আচরণ করেছেন ও রাসূল (সা.)-এর শিক্ষার ওপর নির্ভর করে কাজ করেছেন, যা ছিল দীর্ঘ ২৩ বছরের শিক্ষা, যা ছিল নীরবতা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের, শান্তি ও সংগ্রামের, জয় ও পরাজয়ের এবং কখনো কখনো মৃত্যুর সাথী। আল্লাহর মনোনীত মানুষ এসেছেন তাঁর মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিতে, সতর্ক করিয়ে দিতে, পাশাপাশি সমগ্র মানব জাতিকে, যিনি মানুষ ছাড়া ভিন্ন কিছু ছিলেননা, যাঁর ছিল মহান গুণাবলী, কিন্তু আমরা যেমন, তেমনই একজন মরণশীল মানুষ।[১] পূর্ববর্তী ওহীসমূহের মধ্যে কুরআনের মধ্যেই আমরা পয়গম্বরীর তিনটি প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। এগুলো হলো যথাক্রমে (ক) আল্লাহর বার্তাবাহক হওয়ার গুণাবলী, যাঁকে আল্লাহর অস্তিত্ব সমগ্র মানব জাতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। (খ) এ বার্তাবাহক হবেন একজন মানুষ ও পথ প্রদর্শক আর অবশেষে (গ) সবচেয়ে উত্তম আচরণ ও নৈতিক গুণাবলী দিয়ে গড়া একটি আদর্শ।

> *আমিতো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানেনা[২] কত মহান তিনি যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে।*[৩]

বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন।[৪]

বল, 'আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ্। সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎ কর্ম করে ও তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাওকে শরীক না করে।'[৫]

তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।[৬]

তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।[৭]

মানুষকুলের মধ্যে সদগুণাবলীর আধার হিসেবে মনোনীত একজন নবী ও রাসূলরূপে তাঁর কর্তব্য এক আল্লাহর ইবাদতের জন্য আহ্বান জানানোর সাথে একটি নতুন পথে গমনের অনুমতি দেয়া যা মহাবিশ্ব তথা সমগ্র সৃষ্টিকে এবং উপাদানসমূহকে বিবেচনায় আনে। ঐসব হৃদয়ের উদ্দেশে প্রথম আয়াত ও সূরাসমূহ নাযিল হয়েছিল, নতুনভাবে যা পূর্ণ হয়েছিল ঈমানের দ্বারা, এগুলোর উদ্দেশ্য ছিল সংকীর্ণ দৃষ্টির মানুষকে পুরাপুরি সংশোধন ও বিগলিত করা। সেখান থেকেই শুরু হয়েছিল বিশ্বকে এবং সর্বোপরি তাদের নিজেদেরকে সম্পূর্ণ বদলে দেয়ার কাজ :

পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে
যিনি সৃষ্টি করেছেন-
সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' হতে।
পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহা মহিমান্বিত,
যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন-
শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানতো না।[৮]

তাঁর আয়াতের ভেতর হতে এর বাইরে তাঁর সৃষ্টি হতে তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্বকে উপলব্ধির পথে প্রাথমিক প্রবেশ একটি নতুন ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি দান করেছিল। বিশ্বকে পর্যবেক্ষণ এবং এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য ঈমানদারকে উৎসাহিত করা হত।

আমি তাদের জন্য আমার নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করব বিশ্ব জগতে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; ফলে তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে-উঠবে যে, তা-ই সত্য। ইহা কি যথেষ্ট নয় যে, তোমার প্রতিপালক সর্ব বিষয়ে অবহিত?[৯]

আল্লাহর হুকুমে এ বিশ্বই *(আল কিতাব আল মানসুর)* সত্য ওহীর প্রথম সমর্থন ও নিশ্চয়তার *(আল কিতাব আল মাসতুর)* কথা বলে তথা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের কথা বলে।

পুরো কুরআনে এ বিষয়টি বিভিন্ন আয়াতে বিধৃত হয়েছে। এর মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর ওপর ঈমান এনে নতুন একটা জগতে প্রবেশ করতে পারে।

> *সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং তাদের অন্তর্বর্তী সমস্তকিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না; কিন্তু তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পার না।*[১০]

এটিই আসলে এক আল্লাহর ওপর ঈমান, এটিই গভীরতম আধ্যাত্মিকতা। যারা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে তাদের কাছেই এ আধ্যাত্মিকতার দ্বার খুলে গিয়েছে। তারা আল্লাহর সৃষ্টিকে নতুনভাবে দেখে :

> *সূর্য ও চন্দ্র আবর্তন করে নির্ধারিত কক্ষপথে,*
> *তৃণলতা ও বৃক্ষাদি মেনে চলে তাঁরই বিধান।*[১১]

বাস্তব ও দৃশ্যমান হওয়ার কারণে বুদ্ধি দ্বারা গ্রহ-নক্ষত্রের পরিভ্রমণের পথকে বুঝা যায় : উপর্যুক্ত আয়াতের প্রথম অংশটি হতে আমরা আমাদের প্রশ্নের জবাব পাই। আয়াতের দ্বিতীয় অংশটি আমাদের অন্তরের ভিতরের অবস্থানকে বর্ণনা করে, আমাদের মনের কথা বলে। এর মাধ্যমে আমরা বৃক্ষরাজি ও নক্ষত্রমণ্ডলীকে অবিরাম সিজদারত দেখতে পাই। ঈমান বা বিশ্বাস হলো নতুন বাস্তবতার একটি বিশেষ পথ যার মাধ্যমে মানুষ আপাত অস্তিত্বহীন আর অপ্রকৃতের (unreal) কাছে পৌঁছে যায়। *আপাত দৃষ্টিতে* মনে হবে কুরআনের বাণী যা হচ্ছে আর যা অনুমিত হতে পারে তার পুরো বিপরীত।[১২]

> *তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন শ্রবণের অধিকারী হতে পারত। বস্তুতঃ চক্ষুতো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়।*[১৩]

গভীরভাবে ঈমানকে উপলব্ধি করা আর সৃষ্টিকর্তার নৈকট্যকে বুঝার জন্য প্রয়োজন বিশ্ব ও নিজেকে জানা আর সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে চিন্তা করা। রাসূল (সা.) এর অশ্রুসিক্ত বিনিদ্র রজনীর এটিই ছিল কারণ। রাসূলের সাথী বিলাল ফজরের সময় বিশ্বাসীদেরকে সালাতে ডাকার জন্য আযান দিতে এলেন। তিনি দেখলেন অন্ধকারে রাসূল (সাঃ) বসে শুধু কাঁদছেন। রাসূল (সা.)-কে বিলাল কান্নার কারণ জানতে চাইলেন। তিনি (সা.) বললেন, 'আমি কি কাঁদবোনা, সপ্ত আকাশমণ্ডলী থেকে এ আয়াত আমার ওপর নাযিল হয়েছে?" এ বলে রাসূল (সা.) তেলাওয়াত করলেন :

> *আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে নিদর্শনাবলী রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্য।*[১৪]

তিনি আরো বললেন, 'দুঃখ তার জন্য যে এ আয়াত শুনেনি আর যে এ আয়াতের বিষয়ে চিন্তা করে না।" কোন দৈব দুর্বিপাকের কারণে বা কোন শাস্তির ভয়ে তিনি কেঁদেছেন তা নয় বরং সমস্ত সৃষ্টির পেছনে যে পবিত্র ও সত্যিকারের একটা অর্থ রয়েছে, যা লালিত হয়েছে দৃশ্যমান আয়াত ও আল্লাহর প্রতি সৃষ্টির পূর্ণ আনুগত্য স্বীকারের মাধ্যমে। সৃষ্টিকর্তার এ বিষয়টি তারই জন্য যার দেখার, শোনার ও *অন্তর দিয়ে উপলব্ধি* করার ক্ষমতা আছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে যারা সত্যকে স্বীকার করে না তাদের জন্য এ গুণাবলীর বিষয়গুলো কল্পনা করা যাবে না।

> *তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তদ্বারা তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চক্ষু আছে তদ্বারা দেখে না এবং তাদের কর্ণ আছে তদ্বারা শ্রবণ করে না।*[১৫]

এটি অন্তর্ভেদী শিক্ষার প্রথম ধাপ : সবকিছুই আল্লাহর উপস্থিতির সাক্ষ্য বহন করে। আর এর মাধ্যমেই মানুষ চরম *তাকওয়ার* দিকে পৌঁছে যেতে পারে এবং ঈমানদারের হৃদয়ে কুরআনের সত্য সুপ্রতিষ্ঠা করতে পারে।

> *ইহা সেই কিতাব; এতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য পথ-নির্দেশ।*[১৬]

এ স্বর্গীয় কিতাবকে অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করতে হবে আর মনের সব প্রশ্নের উত্তর এখান থেকে খুঁজতে হবে। আদম (আ.) থেকে রাসূল (সা.) পর্যন্তমানবজাতির দীর্ঘ ইতিহাস, তাঁর সাহাবীদের ইতিহাস আর আগামী দিনের ইতিহাসকে আমাদের জানতে হবে।[১৭]

এভাবেই আল্লাহর ওহী ইতিহাসের ওপর নতুনভাবে আলোকপাত করে আর আমাদের বিশ্বাস ও আল্লাহ ভীরুদের মাধ্যমে আমাদের চারপাশের এবং তার বাইরের জগৎ সম্পর্কে আমাদেরকে চিন্তা করার সুযোগ করে দেয়। অতীতের মধ্যে ডুবে গিয়ে আমরা একটা নতুন প্রেক্ষাপট, নতুন ধরনের একটি অদৃশ্যমান জগৎ সম্পর্কে জানতে পারি। এ জগত সৃষ্টির সময়ে আমরা ছিলাম না বা এটিকে আমরা দেখিওনি, আল্লাহ তার আকাশমণ্ডল আর পৃথিবী সৃষ্টির ব্যাপারে আমাদেরকে সাক্ষ্য হিসাবেও রাখেন নি, এমনকি আমাদের সৃষ্টির বেলাতেও কোনরূপ সাক্ষ্য রাখা হয়নি।[১৮] আল্লাহর ওহী আমাদের সময়কে অতিক্রম করে যায়। এটি মানুষ সৃষ্টিরও পূর্বের বিষয় :

> *স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশতাদের বললেন : ... 'আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি।'*[১৯]

এবং আমরা তাঁর সৃষ্টির প্রথম প্রভাতটি অবলোকন করলাম :

> *এবং তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন, তৎপর সে সমুদয় ফিরিশতাদের সম্মুখে প্রকাশ করলেন এবং বললেন, এ সমুদয়ের নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। তারা বলল, 'আমাদেরকে যা*

শিক্ষা দিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের তো কোন জ্ঞানই নেই। বস্তুতঃ আপনি জ্ঞানময় ও প্রজ্ঞাময়।"[২০]

প্রথম নবী আদমের ঘটনার সাথে সাথে আল্লাহ ওহী দ্বারা ঈমানদারদেরকে জ্ঞানময় অতীতের আর মহাবিশ্বের অভিজ্ঞতা দান করেছেন যার সম্পর্কে মানুষের কোন জ্ঞানই ছিলনা— 'এ জ্ঞান ছিল মানুষের— অতীত অভিজ্ঞতারও বাইরে।"[২১] এটি মহাবিশ্বের এমন একটি স্থান যেখানে আল্লাহর ফিরিশতারা বসবাস করে, যারা প্রতি ঘন্টা, মিনিট, মুহূর্তে অবিরাম সর্বশক্তিমান আল্লাহর গুণগান করে। এটি অদৃশ্য এক জগত, জৈবিক অনুভূতির বাইরের জগত। এ জগতের ওপরই বিজ্ঞানী বা যুক্তিবাদীরা, বিশ্লেষণী দর্শন গবেষণা করে থাকে : এখানে মানুষ অনুভূতির স্পর্শ পায়, মানুষের গভীর বিশ্বাস জন্মে, আধ্যাত্মিক সত্তা ও শক্তির বিষয়ে মানুষ চিন্তা করতে পারে। জন্মের পর মৃত্যুর, বিশ্বজগত সৃষ্টির উদ্দেশ্য, আল্লাহর ওপর ঈমানের বিষয়কে মানুষ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। মানুষের এ ঈমান হবে আদি ও অনন্তের প্রারম্ভিক পদ্ধতির ওপর যা এ সময়ে মানুষের মধ্যে মযবুত হবে ও আরও বেশী করে ঈমান বৃদ্ধি পাবে।

এ প্রেক্ষাপটকে নিয়ে নতুন আলোকে মানুষের ইতিহাস অধ্যয়ন করা হয়ে থাকে। এর আলো মানুষের চিন্তার সকল দিককে আলোকিত করে। এ এক অর্থবহ আলো, এটি আমাদের জানা কাহিনী ও ঘটনাপ্রবাহের বাইরের ইতিহাসের একটি বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট আমাদের সম্মুখে প্রকাশ করে। আদমের পর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষের কাছে যত নবী-রাসূল এসেছেন তাঁরা সবাই মানুষকে এক আল্লাহর ওপর ঈমান আনার বিষয়টি শিক্ষা দিয়েছেন :

আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তাঁর প্রতি এ প্রত্যাদেশ ব্যতীত যে, 'আমি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই; সুতরাং আমারই ইবাদত কর'।[২২]

আদম, নূহ, ইবরাহিম, মূসা, ঈসা থেকে মুহাম্মদ পর্যন্ত একটি জ্বলন্ত সত্য এক আল্লাহর অস্তিত্ব। এক আল্লাহই সমগ্র বিশ্বের একমাত্র ত্রাণকর্তা। আল্লাহ এ বস্তুগত ও রূহানী জগতের রক্ষাকর্তা। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন. মৃত্যুর পর তাঁর কাছে আমাদের প্রত্যেককে ফিরে যেতে হবে। এক আল্লাহই শেষ বিচার দিবসের মালিক।[২৩] আল্লাহর কিতাবে মানুষের বিষয়টি বিধৃত হয়েছে, প্রকৃতির প্রয়োজনীয়তার বিষয়টির জবাব দেয়া হয়েছে। মানুষের এরূপ ইতিহাস আর প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি মানুষের বর্তমান জীবনকে দখল করে আছে আর মানুষ এ আবশ্যকীয়তার মধ্যেই নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছে। মানুষ তার এরূপ প্রয়োজনীয়তার মধ্যে আল্লাহ, তাঁর নিদর্শনসমূহ, তাঁর ফেরেশতা, আখেরাতের জীবন আর শেষ বিচার দিবসকে সহজেই ভুলে যেতে পারে। আদম যখন প্রথমবার ভুলে গিয়েছিলেন তখন তাকে বলা হয়েছিল :

যখন আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট সৎপথের কোন নির্দেশ আসবে তখন যারা আমার নির্দেশ অনুসরণ করবে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।[২৪]

উপর্যুক্ত আয়াতে যে দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে তা মানবজাতির জন্য বিশেষভাবে অবতীর্ণ ওহীতে ইতিহাসের মাধ্যমে রূপায়িত হয়েছে। একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সমগ্র মানবজাতির মধ্যে মুসলিম জনগোষ্ঠীর নিমিত্ত ওহী নাযিল হয়েছে। প্রত্যেক নবীকে আল্লাহ দিকনির্দেশনা দেন। আল্লাহর ইবাদত করার পদ্ধতি শিখিয়ে দেন।

তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি এর পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষকরূপে। সুতরাং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে তুমি তাদের বিচার নিষ্পত্তি করো এবং যে সত্য তোমার নিকট এসেছে তা ত্যাগ করে তাদের খেয়ালখুশীর অনুসরণ করো না। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আইন ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করেছি। ইচ্ছা করলে আল্লাহ তোমাদেরকে এক জাতি করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তদ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান।[২৫]

কুরআনে পূর্বেকার কিতাবসমূহের যথার্থতা সম্পর্কে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। কুরআন থেকে জানা যায় যে, পূর্বেকার প্রত্যেক সম্প্রদায়কে আলাদা আলাদা বিধি-বিধান ও জীবন বিধান দেয়া হয়েছিল। ইতিহাসের পথ পরিক্রমায় আল্লাহর বাণী ছিল একই। আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তবে আল্লাহর ইবাদত পদ্ধতিতে ছিল ভিন্নতা, কুরআনের এ আয়াতে শিক্ষার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে : আল্লাহর সাথে, আমাদের যে সম্পর্ক তা শুধু প্রকৃত অর্থে অন্তরের বিষয়ই নয়, এটি হলো এক নিখাদ বিশ্বাস বা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলদের ওপর বিশ্বাস। আমাদের বিশ্বাসকে বিশেষ ভঙ্গীতে প্রকাশ করতে হবে। আল্লাহর কিতাব আর রাসূলের ওপর বিশ্বাস ঘোষণার মাধ্যমেই তা প্রকাশ করতে হবে। অপরদিকে বিশ্বাসের বিষয়টি বুঝানোর জন্য বিশেষ উপায়ে প্রকাশ করতে হবে। সেটি হবে আল্লাহ তাঁর কিতাবে এবং নবী-রাসূলগণ যেভাবে তা প্রকাশ করেছেন ঠিক সেভাবে।

এ বিষয়টি রাসূল ও তাঁর সাহাবীদের কাছে দীর্ঘ ২৩ বছরের মিশনের শুরু থেকেই চলে আসছিল। বিশ্বাস স্থাপনের জন্য রাসূলের প্রতি নাযিলকৃত বিধি-বিধানের মাধ্যমে আমাদেরকে তা করতে হবে। ইসলামের প্রথম যুগে মুসলমানরা এভাবেই ঈমান এনেছিলেন। প্রথম যুগের মুসলমানরা ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথেই কিছু বিধি-বিধানের মাধ্যমে ইবাদত করার বিষয়টি বুঝতে পেরেছিলেন। আস সুয়ূতি বর্ণিত কুরআনের তিয়াত্তরতম সূরা *আল মুযযামমিল* (বস্ত্রাচ্ছাদিত)-এ রাত্রিকালীন ইবাদতের বিষয়ে বলা

হয়েছে। প্রাথমিক অবস্থায় এ সালাত/ ইবাদতটি ফরয এর ন্যায় আবশ্যকীয় ছিল। উপর্যুক্ত সূরায় বলা হয়েছে :

> *তোমার প্রতিপালক তো জানেন যে, তুমি জাগরণ কর কখনও রাত্রির প্রায় দু' তৃতীয়াংশ কখনও অর্ধাংশ এবং কখনও এক তৃতীয়াংশ এবং জাগে তোমার সঙ্গে যারা আছে তাদের একটি দলও এবং আল্লাহই নির্ধারণ করেন দিবস ও রাত্রির পরিমাণ, তিনি জানেন যে, তোমরা এর সঠিক হিসাব রাখতে পার না। অতএব আল্লাহ তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হয়েছেন। কাজেই কুরআনের যতটুকু আবৃত্তি করা' তোমাদের জন্য সহজ ততটুকু আবৃত্তি কর।*[২৬]

এরপর রাসূল (সা.) এর ওপর কিছু কিছু ওহী নাযিল হয়। এ ওহী ছিল কিভাবে মুসলমানরা তাদের দৈনন্দিন ইবাদত বন্দেগী করবে সে ব্যাপারে।[২৭] রাসূল (সা.) তাঁর সাহাবীদেরকে বলেছিলেন, 'আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখ তোমরা সেভাবে সালাত আদায় কর"।[২৮] অল্প অল্প করে, ধীরে ধীরে প্রথম সম্প্রদায়টি সালাত আদায় করার নিয়ম শিখে ফেললেন। কুরআন নাযিলের মাধ্যমে আস্তে আস্তে শিক্ষা পদ্ধতির সাহায্যে মুসলিমগণ নির্দিষ্ট নিয়মে তাদের সালাত আদায় করার নিয়ম শিখে নিলেন। মুসলমানদের সালাত কুরআন নির্দেশিত বিধি-বিধানের মাধ্যমে চালু হয়ে গেল। এভাবে দীর্ঘ ২৩ বছর শিক্ষার পর মুসলমানরা শুনতে পেল :

> *আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম।*[২৯]

ইসলামের পাঁচটি খিলানের (ঈমান, সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ) প্রত্যেকটিই হয় আল্লাহর কুরআন অথবা রাসূলের অনুশীলনের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সালাতকে এমনভাবে শেখানো হয়েছে ও অনুশীলন করানো হয়েছে যে, একজন ঈমানদারকে সত্যিকার অর্থে যেভাবে আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয়া উচিৎ সেভাবেই করা হয়েছে। আর এভাবেই মুসলমান বা ঈমানদার আল্লাহর প্রতি প্রকৃত *শাহাদা'র* প্রমাণ দিয়ে থাকে : 'আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল।" এ চারটি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে স্মরণ করার উপায় ছাড়া আর কিছুই নয়, এগুলো মানবজীবনের স্মর্তব্য বিষয়, মানুষ এগুলোকে স্মরণে রেখে তার জীবন পরিচালনা করবে। মানবেতিহাসে কুরআন যেমন অনুসরণীয় বিষয় এ খুঁটিগুলোও তেমনি।[৩০]

মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই ভুল আর অবহেলাপ্রবণ। এ খুঁটির বিষয়গুলো মানুষকে যোগ্য করে তোলে। *ঈমানের* ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে আল্লাহর নির্দেশিত সঠিক পথে চলতে সাহায্য করে। মানবজাতিকে *আলামুল গায়েবে* পৌঁছার জন্য সবসময় ঈমানকে মযবুত করে গড়ে তুলতে হবে। এ খুঁটিগুলো আমাদের ভেতরের ও বাইরের আমলকে মযবুত

করার জন্য আবশ্যকীয় বিষয়, এগুলো ছাড়া আমাদের ভেতর ও বাইরে কোনটিই ঠিক হবে না। আমাদের ভেতর ও বাহিরকে সার্বিকভাবে ও সবসময়ে ঈমানের আলোতে আলোকিত করে তুলতে হবে।

আল্লাহর এ শিক্ষার বিশেষ অর্থটি ছিল সাধারণ, রাসূল ও তাঁর সাহাবীদের হৃদয়মনে স্পষ্ট। মুসলমানদের *ঈমান* আর *ইবাদতের* মধ্যকার গভীর সম্পর্কের ভেতরেই তা বিদ্যমান দেখতে পাওয়া যায়। তাদের *ঈমানের* মধ্যে আল্লাহর ওহীর ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ ছিল না। আসল কথা হলো *ঈমানের* প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি দৈনন্দিন সালাতের মধ্যেই পরিস্ফুট হয়ে উঠতো। সেজন্য ঈমানকে মযবুত ও গভীর করার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা চালানো হতো।

এ মূলনীতিটি প্রথম বিবেচ্য বিষয় হলেও আল্লাহর ওহী ও রাসূল (সা.) সম্পর্কে ঈমানদারকে যা শিখানো হয়েছে তা-ই যথেষ্ট নয়। আল্লাহর সাথে মুমিনের যে সম্পর্ক তাকে *ঈমান* আর *ইবাদাতের* মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যাবে না। এ দু'টো বিষয় লক্ষ্য হলেও এগুলো আসলে *ঈমানের* ক্ষেত্রে শুরুই মাত্র। *ঈমান* ও *ইবাদত* আল্লাহর ওহীর ভেতরের বিষয় এবং এর প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত বিষয়ই। আল্লাহর ওহী জীবনের সর্বত্রই আলোর বিচ্ছুরণ ঘটায়। *ঈমান* আর *ইবাদত* মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় আর মানুষের জীবনে আলো দান করে। এর সাহায্যে ঈমানদাররা পথ দেখতে পায়। তারা পথ খুঁজে পায় আর জীবনের পছন্দনীয় বিষয়কে বেছে নিতে পারে। কুরআনের শিক্ষা স্পষ্ট : কুরআন ঈমানদার আর আল্লাহর মধ্যকার বিধিবদ্ধ যোগসূত্র রচনাকারী (*ধর্ম* কঠিনতম অর্থে ও শাব্দিক অর্থে যোগসূত্র রচনাকারী বিষয়ই বটে)। আল্লাহ আর ঈমানদারের সম্পর্ক হলো জীবনবিধান। মু'মিন তার ঈমান, দৈনন্দিন *ইবাদত বন্দেগী* দ্বারাই তার সাধারণ আচার-আচরণ, নিজস্ব আমলের মধ্যে ঈমানের গভীরতা ও যথার্থতা ফুটিয়ে তোলে। কুরআনে খাঁটি মু'মিন সম্পর্কে বলা হয়েছে 'মুমিন হবে সৎকর্ম পরায়ণ"।[৩১]

আল্লাহর সামনে মানুষ অন্য মানুষের সাথে বসবাস করে, অন্যের সাথে আচার-আচরণ করে, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ভাগাভাগি করে ভোগ করে, সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখে। একে অপরকে ভালবাসে, পরস্পরের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তোলে, সুখ-দুঃখে একে অপরের শরীক হয়। কুরআন হাদিসে আমরা দেখতে পাই মুমিনের দৈনন্দিন কার্যাবলী, পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব, আত্মীয়-স্বজন, মুসলিম-অমুসলিম, শত্রু-মিত্র সবার সাথে আচরণের ব্যাপারে অনেক নির্দেশনা ও পরামর্শ রয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে রাসূলই সবগুণের অধিকারী।

তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।[৩২] রাসূল (সা.) তাঁর দৈনন্দিন জীবন প্রণালী, আচার-আচরণ, ভালবাসা, দয়া দাক্ষিণ্য, উদারতা, ন্যায়পরায়ণতার মাধ্যমে মানুষকে পথনির্দেশ দিয়েছেন। রাসূল (সা.) সবসময় তাঁর সাহাবীদের ব্যাপারে বলেছেন, তারা

একে অপরের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখে, একে অপরের জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তারা অন্যান্য মানব সম্প্রদায়, জীবজন্তু, প্রকৃতি সর্বোপরি মুসলিম-অমুসলিম, নারী-পুরুষ, আবালবৃদ্ধবণিতা সবার সাথে সদ্ভাব বজায় রাখে। রাসূল (সা.) বলেন,

"ন্যায়পরায়ণতা হলো উত্তম জীবনের মাপকাঠি (খুলুক, নৈতিকতা)"।[৩৩] 'মুমিনদের মধ্যে তারাই খাঁটি ঈমানদার যারা উত্তম নৈতিক গুণের অধিকারী এবং তারা সর্বোত্তম যারা তাদের স্ত্রীদের প্রতি সবচেয়ে বেশী দয়াপরবশ।"[৩৪] আল্লাহর রাসূল আরেক হাদিসে বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সেই সবচেয়ে উত্তম যে তার পরিবারের কাছে উত্তম।"[৩৫] তিনি আরো বলেন, 'সে খাঁটি ঈমানদার নয় যে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তার ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ করে না।"[৩৬] 'সে খাঁটি মু'মিন নয় যে নিজে পেট ভরে খেল অথচ তার প্রতিবেশী না খেয়ে থাকলো।"[৩৭] নৈতিক শিক্ষার এরকম আরো অনেক হাদিসের কথা এখানে বর্ণনা করা যাবে। সবগুলো হাদিসেই এরূপ নৈতিক গুণাবলীর কথা বলা হয়েছে। সবাইকে নিজের ঈমানকে পাকাপোক্ত করার জন্য সদ্‌গুণাবলীর অধিকারী হতে হবে।

ক্ষুদ্র জীবন পরিসরে পৃথিবীতে মানুষের অবস্থান হবে অর্থবহ, সমাজের কাজে মানুষকে অবদান রাখতে হবে। আল্লাহর প্রতি মানুষের চেতনাবোধের এটিই হলো আসল পন্থা।

আল্লাহর কুরআনে এটিকেই মুসলিম সমাজের মূল কাজ বলে অভিহিত করা হয়েছে। মুসলিমদের এ দায়িত্ববোধকে কেবল তাদের অন্তর্নিহিত গুণাবলী হিসাবেই গ্রহণ করা হয়নি বরং মানুষের সৎকাজকেই একমাত্র মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। আর এর মাধ্যমেই মানুষে মানুষে পার্থক্য করা যেতে পারে :

> *তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান কর, অসৎ কাজে নিষেধ কর এবং আল্লাহয় বিশ্বাস কর।*[৩৮]

রাসূল (সা.) মুসলিমদেরকে সর্ব অবস্থাতে দায়িত্ববোধের সজীব সচেতনতায় উজ্জীবিত হয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানান : 'তোমাদের কেউ কোন খারাপ কাজ হতে দেখলে হাত দিয়ে তা বন্ধ কর, তা যদি না পার তোমার কথা দিয়ে, তা যদি না পার তাকে অন্তর দিয়ে ঘৃণা কর, আর তা হচ্ছে ঈমানের সবচেয়ে দুর্বল অবস্থা"।[৩৯] মুসলিমদের অঙ্গীকার হবে স্থায়ী, যেমন তার ফলাফলও স্থায়ী। আর এটাই হবে প্রকৃত ঈমানের সবচেয়ে বড় নমুনা, ন্যায়-নিষ্ঠা ছাড়া মুসলিম খাঁটি ঈমানদার হতে পারে না। মুসলমানদেরকে প্রতিটি মুহূর্তেই ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে জীবন-যাপন করতে হয়। ঈমানের দাবির কারণেই কঠিনভাবে ন্যায়নিষ্ঠতা মেনে চলতে হয়। মুসলিম-অমুসলিম, মযলুম আর যালিম সবার প্রতিই মু'মিনকে ন্যায়-নিষ্ঠতা মেনে চলতে হয়। রাসূল (সা.)

তাঁর সাহাবীদেরকে আপাতঃদৃষ্টিতে অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও বলেছিলেন : 'সাহায্য কর তোমার ভাইকে সে যদি কোন অন্যায়ও করে থাকে অথবা তার প্রতিও কেউ অন্যায় করে।" রাসূল (সা.)-এর এ কথা শুনে জনৈক সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ আমরা বুঝলাম যে, কেউ যদি তার প্রতি অন্যায় করে থাকে তাহলে তাকে সাহায্য করতে হবে, কিন্তু সে নিজেই অপরাধ করলে আমরা তাকে কিভাবে সাহায্য করবো?" রাসূল (সা.) জবাবে বললেন, 'অন্যায় করা থেকে তাকে বিরত রাখ, এটিই তার জন্য সাহায্য।"[৪০] ন্যায়বিচার করতে গিয়ে শুধু যে মুসলিমদেরকে সমর্থন করতে হবে তা' নয় : ইসলামের দৃষ্টিতে সবচেয়ে বড় ইহসান হলো, ন্যায় বিচারের যে আদর্শ রয়েছে তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, মু'মিনদের ব্যর্থতা ও দুর্বলতাগুলোর উর্ধ্বে ন্যায়বিচারকে স্থান দেয়া। আল্লাহ স্বয়ং রাসূল (সা.) কে *আদল* ও *ইহসান* প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাগিদ করেছেন। *আদল* ও ইহসান দু'টোই ঈমানের অপরিহার্য অংশ। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) এর নিকট অষ্টম *সূরা নিসা* অবতীর্ণ হয়েছে। এ *সূরায়* দেখা যায় জনৈক ইহুদীকে মিথ্যা অভিযোগ থেকে রেহাই দেয়া হয়েছে আর জনৈক মুসলিমকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। ঐ মুসলিমটির নাম ইবনে উবায়রিক, সে একটি বর্ম চুরির ঘটনায় জনৈক ইহুদীকে অভিযুক্ত করে। এসময় রাসূল (সা.) এর ওপর সত্য ঘটনা বর্ণনা করে ওহী নাযিল হয় যখন ইহুদী গোত্রগুলো মদীনার মুহাজির কুরাইশ মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল :

> তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি আল্লাহ তোমাকে যা জানিয়েছেন সেই অনুসারে মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা কর, এবং বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের সমর্থনে তর্ক না করো।[৪১]

মুসলিম সম্প্রদায়ের খুব দুরবস্থার দিনেও সব কিছুর বিবেচনায় ন্যায় বিচারের বিষয়টি সবকিছুর উর্ধ্বেই ছিল। রাসূল (সা.) এ বিষয়টি বুঝতে পেরেছিলেন ও তাৎক্ষণিকভাবে বাস্তবায়ন করেছিলেন। ন্যায়নিষ্ঠা প্রদর্শনের ব্যাপারে কুরআনের আরো দু'টো আয়াত নাযিল হয়েছে। এ আয়াতগুলোর মধ্যেও ন্যায়বিচার, আল্লাহ ভীতি ও ন্যায়নিষ্ঠা প্রদর্শনের ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ রাখা হয়নি।

> *হে মু'মিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ যদিও ইহা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান হোক অথবা বিত্তহীনই হোক আল্লাহ উভয়েরই যোগ্যতর অভিভাবক। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করতে কামনার অনুরাগী হয়ো না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল অথবা পাশ কাটিয়ে যাও তবে জেনে রাখ যে তোমরা যা কর আল্লাহ তার সম্যক খবর রাখেন।*[৪২]